বাংলাদেশ ও মৌলবাদ

মইদুল ইসলাম

নব্বইয়ের দশকের শেষ থেকে বাংলাদেশে, ইসলামি কট্টরপন্থীদের একাংশ সম্পূর্ণ উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকে গিয়ে কখনো আওয়ামি লিগের রাজনৈতিক নেতাদের আক্রমণ করছে, তো কখনো শিক্ষক, সাংবাদিক, আইন-আদালতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আহমাদিয়া (কাদিয়ানী) সম্প্রদায়ের মানুষের উপরে আক্রমণ করছে। ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের আগ্রাসী মনোভাব ও বহু ক্ষেত্রে নির্মম হত্যালীলার সাম্প্রতিক কয়েকটা খবর এইরকম। গত বছর ২৬ ফেব্রুয়ারি, এক যুক্তিবাদী ও মুক্তমনা ব্লগার, অভিজিত রায় খুন হন কিছু ইসলামি কট্টরপন্থীদের হাতে। আবার গত বছর ৩০ মার্চ, যুক্তিবাদী ও মুক্তচিন্তার সমর্থক, আরেকজন ব্লগার, ওয়াশিকুর রহমানকে খুন করে সমমনভাবাপন্ন ধর্মীয় কট্টরপন্থীরা। ২০১৩ সালে আরেকজন ব্লগার, আহমেদ রাজীব হায়দারকেও একইভাবে খুন করা হয়।

এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে, ইসলামি জঙ্গিদের দ্বারা মন্দির প্রাঙ্গনে এক হিন্দু পুরোহিতকে ছুরি মেরে খুন করা হয় এবং এক ভক্তকে আহত করা হয়। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ষাট বছরের এক হিন্দু আশ্রম কর্মীকে 'ইসলামিক স্টেট' জঙ্গিরা খুন করে পালায়। গত এপ্রিল মাসে, ঢাকায়, আটাশ বছরের নাজিমদ্দিন সামাদ নামক এক ব্লগার তথা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্রকে খুন করা হয়। ওই একই মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আটান্ন বছরের ইংরেজির অধ্যাপক, রেজাউল করিম সিদ্দিকীকে ছুরি মেরে খুন করা হয়। এর আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো তিন অধ্যাপককে ইসলামি জঙ্গিরা খুন করে বলে অভিযোগ। ওই এপ্রিল মাসেই এক হিন্দু দর্জিকে খুন করা হয় এবং বাংলাদেশের প্রথম সমকামী পত্রিকার সম্পাদককে তাঁর ফ্ল্যাটে ঢুকে ইসলামি জঙ্গিরা খুন করে। তালিকা দীর্ঘ।

বাংলাদেশের এক প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী গত দেড় বছরে, ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীদের দ্বারা খুন হয়েছে অন্তত সাতচল্লিশ জন। এর মধ্যে আটজনকে খুন করার অভিযোগ আল-কায়দা পন্থী আনসার-আল-ইসলামের দিকে আর আটাশ জনকে খুন করার অভিযোগ ইসলামিক স্টেট তথা আইসিস পন্থী জঙ্গি গোষ্ঠীর দিকে।

আনন্দের কথা যে বাংলাদেশে, সম্প্রতি লক্ষাধিক মুসলিম উলেমা (ইসলাম ধর্মের পন্ডিতবর্গ) সরবে বলেছেন যে ইসলামি আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ধর্মের নামে উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ 'হারাম' (নিষিদ্ধ ও বর্জনীয়)। মৌলানা ফরিদউদ্দিন মাসুদ, যিনি বাংলাদেশের জমিয়ত-উল-উলামার সভাপতি তথা পূর্ব বঙ্গের কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়াতে সর্ব বৃহৎ ঈদের নামাজ পড়ানোর ইমাম, একটি ফতোয়া (ধর্মীয় নির্দেশ) জারি করে বলেছেন যে 'ইসলাম শান্তির ধর্ম', 'ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না', 'কিছু উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের জিহাদী ভেবে ভুল করছে' এবং কুরান ও হাদীস (ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক, হজরত মুহাম্মদের জীবন ও বাণীর সংকলন)-কে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে আত্মহননকারী সন্ত্রাসবাদীরা নরকে যাবে। তিনি একথাও বলেছেন যে 'উগ্রপন্থী, সন্ত্রাসবাদী ও খুনের সাহায্যকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে (শেষকৃত্য সম্পন্ন হবার আগের প্রার্থনা) সামিল (শরিক) হওয়াও হারাম। এবং যাদের উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে দৃষ্টিভঙ্গি রাখার জন্য খুন হতে হয়েছে তারা আসলে শহীদ'। এহেন ফতোয়ায় বাংলাদেশের এক লক্ষ, এক হাজার পাঁচশো চব্বিশ জন (১,০১,৫২৪) মুফতি (ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞ) ও আলিম (ইসলাম ধর্মের পণ্ডিত) স্বাক্ষর করেছেন। আরো আশার কথা যে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশ সরকারের পুলিশ ৮৫৬৯ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে যার মধ্যে ১১৯ জন সন্দেহভাজন উগ্রপন্থী ও ৫৩০০ জন সন্দেহভাজন অপরাধী। তবে ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের এহেন পুলিশি গ্রেফতার বহু ক্ষেত্রে বিরোধী দল, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির উপরে আওয়ামি লিগ পরিচালিত বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগকেও সামনে এনে দিয়েছে। যেমন বর্তমান বাংলাদেশ সরকার সে দেশে ইসলামিক স্টেট ও

অন্যান্য ঘাতক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে দাবি করছে যে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ, বিদেশি যোগের পরিবর্তে দেশের মাটিতে লালিত পালিত হচ্ছে, সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে আসলে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির যোগাযোগ আছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় পাটির দাবি যে সম্প্রতি সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে সাড়ে আট হাজার গ্রেফতারের মধ্যে তাদের দুই হাজার কর্মীকে জোর করে অন্যায়ভাবে আটক করা হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল যে ইসলামি মৌলবাদীদের কাউকে যেকোনো কারণেই হোক, খুন-জখম করা, বা হুমকি দেওয়ার কে অধিকার দিল? ইসলাম তো শান্তির বার্তা দেয়। কুরানের সুরা আল বাকারার ২৫৬ নম্বর আয়াতে পরিষ্কার বলা আছে যে 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো বলপ্রয়োগ নয়'। পয়গম্বরের জীবন ও বাণী যা হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে সেখানে তো এমন কয়েকটা উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে তিনি অনেক অপমান ও কটুক্তিকে কিছু ক্ষেত্রে উপেক্ষা করেছেন তো অন্যান্য ক্ষেত্রে অপমানকারী ও কটুক্তিকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাহলে এইসব ইসলামি মৌলবাদীরা কেমন মুসলমান যারা কুরান হাদীসের কথা মানে না? এরা কেমন ধর্মপ্রাণ মানুষ যারা অন্য মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে খুন করতে উদ্যত হয়?

ধর্ম বা কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শকে নিন্দা করার জন্য বা সেই সম্পর্কে কটু কথা বলার জন্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মৌলবাদীদের হাতে যদি কাউকে খুন হতে হয় অথবা কেউ আশঙ্কাজনকভাবে আক্রান্ত হন তাহলে সেটা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মৌলবাদীদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অপরিণত, ভঙ্গুর, এবং অসুরক্ষিত ভাবাবেগই প্রকাশ পায়। এহেন কান্ডের জন্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মৌলবাদীরা কিন্তু কোনো দুর্দমনীয় সাহসের পরিচয় দেয় না। বরং তাদের দুর্বলতা, নৈরাশ্য এবং মতাদর্শগত প্রচারের বিফলতা আরো বেশি করে প্রকট হয়। কেউ যদি সত্যি কোনো একটি বিশ্বাসে (ধর্মীয় বা রাজনৈতিক) বিশ্বাসী হন এবং নিজের বিশ্বাসে যদি অটুট থাকেন তাহলে অন্য যে কেউ তাঁর বিশ্বাস নিয়ে যতই গালমন্দ করুক না কেন তাতে বিশ্বাসী মানুষের কিছু যায় আসার তো কোনো কারণ নেই।

এখন প্রশ্ন হল ইসলামি মৌলবাদীরা কেনই বা ধর্মের নামে কটুক্তি সহ্য করতে পারে না? তারা যদি 'মহাপ্রলয়ের' শেষ বিচারের দিন (কেয়ামত), যেদিন পাপ পুণ্যের হিসেব হবে তা বিশ্বাস করে তাহলে তো তারা পৃথিবীতে ধর্মের নামে কুৎসাকারী পাপীর শাস্তি, ঈশ্বর বা আল্লাহর উপর ছাড়তে পারে। নিজেদের আল্লাহর স্বঘোষিত সেনানী হিসেবে জাহির করে আইন কানুন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার কী প্রয়োজন? আসলে যুক্তিবাদী ও মুক্তচিন্তার প্রতি ইসলামি মৌলবাদীদের হিংসাত্বক আক্রমণ আজকের পৃথিবীতেই সম্ভব যেখানে মৌলবাদীদের অস্তিত্বকে আধুনিক ও উত্তরআধুনিক জীবনযাত্রা এবং প্রশ্নগুলো চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। ইসলামি মৌলবাদের এই আক্রমণাত্মক রূপ তাই মধ্যযুগে খুব একটা পাওয়া যেত না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে অষ্টম আর একাদশ শতাব্দীর মাঝে চারজন বরেণ্য মুসলিম দার্শনিক: আবু বকর মুহাম্মদ ইবন জাকারিয়া আল-রাজি, ইবন আল-রাওয়ান্ডি, আবুল আলা আল-মারি এবং আবু ইসা আল-ওয়ারাকদের অনেক বক্তব্য ও তাঁদের সঙ্গে মুতাজিলা দার্শনিক চিন্তা শুনলে আজকের মৌলবাদীরা কানে হাত তো দেবেনই, দু-চারটে ছোটোখাটো যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতেও পিছপা হতেন না। এদের সঙ্গে যদি বেশ কিছু সুফী চিন্তাভাবনাকে যোগ করা যায় তাহলে আজকের মৌলবাদীরা এদের প্রত্যেককে ঈশ্বরনিন্দুক বা নিদেনপক্ষে ধর্মনিন্দুক ছাড়া আর কিছুই বলবে না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে ওই সব বরেণ্য দার্শনিক ও সুফিবর্গকে কোতল করা হয়নি।

মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্ব তখন প্রথম বিশ্ব যার ধারে ভারে ইউরোপের হাল তখন খানিকটা দ্বিতীয় বিশ্বের মতো। ইউরোপ তখন গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। জোয়ান অফ আর্ককে 'হেরেসি' বা প্রচলিত খ্রিস্টান ধর্ম মতের বিরুদ্ধচারনের জন্য পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে ক্যাথলিক চার্চ নিন্দা করছে আর ভারতে সতীদাহ প্রথা তখন সমাজে ভীষণভাবে বিদ্যমান। মুসলিম বিশ্ব তখন ক্ষমতাসীন থাকার সুবাদে ধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী মানুষ ও নিন্দুকের তীব্র বক্তব্যকে অনেক সময় উপেক্ষা করতে পারতো। ঠিক যেমন পৃথিবীর যেকোনো রাষ্ট্রনায়ক বা শাসক, নিত্য দিন প্রচুর মানুষের গালিগালাজ খেয়ে নিন্দুকদের মারতে বা জেলে পুরতে উদ্যত হন না। মৌলবাদীদের মতো 'ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে' বলে পাল্টা যুক্তি-তর্ক না দিয়ে দুমদাম মানুষ খুন করেন না। মৌলবাদীদের হিংসাত্মক আক্রমণ তাই তাদের আধুনিক পশ্চিমী ভাবধারা ও জীবনযাপনের কাছে হেরে যাওয়ার যন্ত্রণা ও পিছিয়ে পড়ার পীড়া থেকে উদ্ভূত। গত তিন শতকে মুসলিম দুনিয়া পশ্চিমী উপনিবেশিকতার কাছে হারছে। সেই পরাজয়কে মৌলবাদীরা মন থেকে মেনে নিতে না পেরে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণায় ধর্মীয় পরিচয়, প্রথা, পরম্পরা ইত্যাদিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে। এবং সেখানে ইসলামি সভ্যতার অনেক গৌরবময় ঐতিহ্যকে সরিয়ে রেখে তারা গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতায় মজে থাকতে চাইছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিশেষ প্রেক্ষাপটকেও মনে রাখা প্রয়োজন। ১৯৭১ সালে, স্বাধীন বাংলাদেশ হবার পরে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ বেশ কিছু

জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকেই মুজিব কতৃত্ববাদী হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জরুরি অবস্থা এবং ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেবল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামি লিগ (বাকশাল) ছাড়া বাকি সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বেআইনি ঘোষণা করার মতো কয়েকটা স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মুজিব, ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত জারি করেছিল। মুজিব কর্তৃত্ববাদী ও সময় বিশেষে, স্বৈরাচারী হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা প্রশ্নাতীত ছিল।

তাই বাংলাদেশে, গত চার দশকে, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি কখনো কর্তৃত্ববাদী হয়ে গিয়ে জনসমর্থন হারিয়ে দুর্বল হয়েছে। ওই কর্তৃত্বপরায়ণ ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে মৌলবাদ তার রাজনৈতিক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সেনা অফিসাররা মিলে হত্যা করার পরে জিয়াউর রহমান ও হুসেন মুহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে দুটো সামরিক অভ্যুত্থান হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সামরিক শাসনকালে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর উপর মুজিব রহমানের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ওঠে এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ ক্রমেই 'ইসলামি' বাংলাদেশে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ও জামাত-এ-ইসলামি মনে করে যে বাংলাদেশে ধর্মকেন্দ্রিক সন্ত্রাসবাদ নেই। তাই তারা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের প্রতি বেশ নরম মনোভাব দেখিয়েছিল। আজ তো বাংলাদেশে এই ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের একটু বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। কিন্তু গত সাত-আট বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কিছুটা বদলে যায়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামি লিগ নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল ও উদার রাজনৈতিক দলগুলোর জোট বিপুল ভোটে জয়ী হবার পরে ধর্মনিরপেক্ষ দাবিগুলো আবার জোরদার হয়। ২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলন, বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিরই ধারক বাহক হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় যুদ্ধপরাধের জন্য কিছু মৌলবাদীদের ফাঁসির হুকুম হয় তো কারওর আমৃত্যু কারাদণ্ডের বিচার হয়। উপরন্তু প্রধান বিরোধী দল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি এবং মৌলবাদী শক্তিগুলো সাংগঠনিক কোণঠাসা অবস্থায় ৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন বয়কট করে। আর বিরোধী শূন্য অবস্থায় আওয়ামি লিগ ফাঁকা মাঠে গোল দেয়। এইরকম একটা সন্ধিক্ষণে মৌলবাদীরা আরো বিচলিত হয়ে পড়ছে আর ধর্ম সম্পর্কে যেকোনো ধরনের মৌখিক আক্রমণকেই তারা নাস্তিকতার প্রচার বলে মনে করছে। যথারীতি, নাস্তিকতার বিরুদ্ধে তারা যুক্তিবাদী ও তার্কিক আদান প্রদান না করে মানুষ খুন করছে। বাংলাদেশের জনতা কিন্তু ভোটের বাক্সে মৌলবাদীদের খুব একটা প্রশ্রয় দেয় না। যুক্তিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের আক্রমণ করে মৌলবাদীরা বড়ো জোর রাজনৈতিক ময়দানে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু গ্রাম মফফ্সলের সাধারণ মানুষের সমর্থন পেতে তারা বেশ বেগ পায়।

বাংলাদেশে ধর্মের নামে রাজনীতি করা দল, জামাত-এ-ইসলামি, কোনদিন তেরো শতাংশ ভোটও পায়নি। সেখানে থাকা মুসলিম সংখ্যাগুরু মানুষের সমর্থন তো দূর কথা। বাংলাদেশ সংসদীয় নির্বাচনের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত জামাত কোনোদিন তিনশোর মধ্যে আঠারোটার বেশি আসন পায়নি। তবে বাংলাদেশে যে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে এমন নয়। ওখানে চিটাগাং-এর আদিবাসীরা, বিহারীরা এবং সংখ্যালঘুদের একাংশ প্রান্তিক জীবনযাপন করছে, নিরাপত্তার অভাব অভিযোগ এবং প্রাণ সংশয় নিয়ে। সেটা বাংলাদেশের কাছে মোটেই গৌরবের বিষয় নয়। তাই শাহবাগের মতো মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ জোরদার আন্দোলন করে, তাদেরকে বাংলাদেশের আদিবাসী, বিহারী ও সংখ্যালঘুদের গণতান্ত্রিক দাবিগুলোকে নিয়েও আন্দোলন করা উচিত। ১৯৪৭ সালে, তৎকালীন পূর্ববঙ্গে, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিল ৩০ শতাংশ। এখন তা ৯ শতাংশে নেমে এসেছে। সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যা বাংলাদেশে কেন ক্রমাগত কমছে তাই নিয়ে সৎ ও খোলামেলা আলোচনা হওয়া দরকার। সেটা না করলে ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা যেমন ঘোলা জলে মাছ ধরার রাজনীতি করবে অন্যদিকে বাংলাদেশের ইসলামি মৌলবাদীরা সংখ্যালঘু আক্রমণের উন্মত্ত খেলায় উৎসাহী হবে। অন্যদিকে মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে একদিকে যেমন অনবরত রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম দরকার তেমন একইসঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক আর্থ-সামাজিক দাবিগুলো যথা বেকারত্ব, দারিদ্র এবং রাজনৈতিক মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা জরুরি। একদিনে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে হার জিতের ফয়সলা হবে না কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য সংগ্রাম একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প।

আরেক রকম

চতুর্থ বর্ষ ত্রয়োদশ সংখ্যা
১-১৫ জুলাই ২০১৬ ১৬-৩১ আষাঢ় ১৪২৩

ওপারে যে বাংলাদেশ
কার সুদিন
হাততালির জোর
শৃঙ্খলাসর্বস্ব
জ্ঞানের দুঃসাহস
কলকাতার স্মৃতি
হস্তিদর্শন
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু
বাংলাদেশ ও মৌলবাদ
বাংলাদেশে সন্ত্রাস
জঙ্গল ছোড়াব নাহি
বড়ো বেদনার মতো
সাংস্কৃতিক সাহস
ভাষার বহুত্ব
কৃষকের দায়
অতঃকিম্
ডাইনি-কথা
বলদের দুধ
রসোপভোগ

মূল্য : ২০ টাকা